সঞ্জয় ভট্টাচার্য

গৌতম বসু

সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে আমি দেখিনি। ১৯৬৯ সালে ষাট বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় কলকাতার দক্ষিণপ্রান্তে সেলিমপুরে, আমি যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র, তাঁর প্রয়াণ ঘিরেও আমার কোনও ব্যক্তিগত স্মৃতি নেই। অথচ, তারও বছর দু'য়েক পূর্বে, অস্পষ্ট মনে পড়ে, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের দেহাবসানের পর, খবরের কাগজে বিস্তর লেখালিখি হয়েছিল। সকলের জ্ঞতার্থে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মৃত্যুসংবাদ সংবাদপত্রে মুদ্রিত হয়েছিল কিনা, আমার মনে পড়ে না। একজন হারিয়ে-যাওয়া কবির জন্য বহু প্রাণ কেঁদে উঠবে, এমন মনে করবার কোনও কারণ খুঁজে পাই না।

মধ্য কলকাতার পি-১৩ গণেশচন্দ্র অ্যাভেন্যু এবং দক্ষিণের ৭৬/৬ সেলিমপুর রোড, এই দুই ঠিকানায় তাঁর জীবনের অনেকটাই কেটেছিল, ওই দুটি অঞ্চলে বিষণ্ণচিত্তে আমি অনেক ঘুরেছি কিন্তু বাড়ি দুটি শনাক্ত করবার মতো মনোবল নিজের মধ্যে সঞ্চয় করতে পারিনি। কৌতুহলের টান অনুভব করেছি বারবার, সেই টান রাস্তার মুখ পর্যন্ত আমায় নিয়েও গেছে, কিন্তু তারপর, কয়েক মুহূর্তেই উৎসাহ নিভে গেছে; যাঁর এত কবিতা ও গদ্য বেঁচে রইল না, তাঁর বাড়ি চিনে নিয়ে, যে মুদির দোকানে দাঁড়িয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে-কিনতে তিনি কবিতার কথা ভাবতেন, সেই মুদির দোকান আজ শনাক্ত করার কোনও অর্থ আমি খুঁজে পাইনি। একটা অন্য অস্তিত্ব, বিরাট এবং গভীর এবং নিস্তরঙ্গ একটি হ্রদের উপস্থিতি আমি তবু টের পাই; অনুভব করি তাঁরই ভাবনা আমার শিরা উপশিরার ভিতর দিয়ে অমলিন বাতাস হয়ে বয়ে চলেছে। এ এক অপূর্ব মৌন সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার নিত্য সাক্ষাৎ হয়। তাঁর গোটা গোটা আত্মবিশ্বাসী হস্তাক্ষর, পৃষ্ঠার কোনের চিত্রকলা, লেখার কাটাকুটি, কোনও একদিন একটি কাব্যগ্রন্থ জন্মাবে এই আশায় পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত লেখা কেটে কেটে সংরক্ষণ করা, তাঁর লেখা অতিসাধারণ, ঘরোয়া চিঠিগুলি, মডেল ফর্ম-এর কয়েকটি আলোকচিত্র—একজন প্রেতের নিটোল জগতে নিঃশব্দে প্রবেশ ক'রে আমি পরমসুখে বসে থাকি কিছুক্ষণ, কবিতা পড়ি, তারপর বেরিয়ে আসি, মিশে যাই আওয়াজে, আর্তনাদে, দম্ভে, চাতুর্যে জীর্ণ এই জগৎসংসারে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি, যে আবিল জগৎসংসারের উল্লেখ আমি করলাম, সেখানে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের এবং তাঁর সাহিত্যকর্মের কোনও স্থান নেই। কোনও স্থান নেই, এই কবিতার :

তবু জায়গা থাকে।
তোমার ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার ছড়িয়ে দাও চারদিকে
তার পরও পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, উর্ধ্ব-অধঃ থেকে যায়,
তোমার অশ্বত্থ-বট মন্দিরের পরও অনেক জায়গা উঁচু হয়ে ওঠে
হিমালয় মেঘ ছুঁয়ে গেলেও থাকে মেঘের ও-পিঠ!
সমুদ্র দিয়ে তুমি ভরাতে পারো না সে-স্থান
পৃথিবীর ব্যাস দিয়ে, ন্যাস দিয়ে ফুরোতে পারো না—
সূর্যে, নক্ষত্রে, নীহারিকায় নয়।
মহাকর্ষের উপবৃত্ত পরাবৃত্ত পার হয়ে
আলোবর্ষের আলোবর্ত্মের অবনমিত অমিত জ্যামিতির শেষেও আবার আকাশ।
আবার স্থান—অসীম ঊর্ধ্ব, অতল অধঃ, অপস্রিয়মান দিগন্ত।

থাকে সময়। ফুরোয় না।
ইতিহাসে ফুরোয় না সে-আশ্চর্য আবহমানতা
ফুরোয় না কোনও বৃত্তান্তের বৃত্তে, বৃত্তে!
ঋতুর চক্রান্তে, বিষুবচিহ্নে, কর্কটে-মিথুনে কতটুকু সময়
পরমাণুর কক্ষপথে কতটুকু, কতটুকু বক্ষে, তোমার হৃৎস্পন্দনে?
তোমার জলমাটি, বস্তুপুঞ্জে কোথায় আছে কাল
বেগে-আবেগে, আস্থায়-প্রতিভায় কোথায় কতটুকু ছিল
মুছে গেল কতটুকু-বা
জানো না।
কী ক'রে জড়িয়ে থাকে সময় তোমার ঘর-বাড়ি-ক্ষেত-খামারে
তোমার ভাঙা মঠে, পুরনো অশ্বত্থের শিকড়ে, জানো না।
কী ক'রে সময় জড়িয়ে থাকে তোমার ক্ষেত-খামার, থাকো তুমি—জানো না।
জড়ায় কি? নিরবধি কালের নদী জড়ায় কি তটের হৃদয়?
গড়ায়, ছেড়ে দিয়ে স'রে যায়—স'রে দাঁড়ায়—গড়ায়।
তুমি শুধু জানো, কিছু ছিল।
কোনও প্রভা বা নিষ্প্রভতা, প্রাণ বা মৃত্যু অনুভব করো—
তাই জানো, বলতে পারো কিছু ছিল, আছে, আসবে।
তোমার অনুভব এই সময়,
তবু এক সময় আছে যা তোমার অনুভব নয়,
আছে এক আশ্চর্য আবহমানতা।

আছে।
তোমার সীমা ছাড়িয়ে বিশালতা
তোমার অনুভবের শব্দেও স্পন্দন।
নিঃস্পন্দতা আছে যা স্পন্দন হতে পারে

আছে শূন্যতা যা হতে পারে বস্তুময়।
আছে।
তোমার বাইরে, মুঠোর বাইরে অপরূপ রূপকথার প্রান্তর মাঠ—স্থান,
স্থানের অরূপ স্তূপ শূন্যতার মঠ—আকাশ,
পূর্ণ হবে ব'লেই শূন্যতা।
তোমার ঋজুতা ছাড়াও অজস্র আঁকাবাঁকা রেখা আছে
রেখা, গতি, ভঙ্গি, ছন্দ
বেগ, আবেগ—অনেক—অনেকেও এক।
এক হয়ে তারা জড়িয়ে থাকে ইতিহাসের অতীতে।
আছে। —তা-ই কি শেষ কথা নয় তোমার
জ্ঞানের, মনের, জীবনের, মরণের সব কিছু নয়?
কেউ থাক, কিছু থাক—
তা-ই, শুধু তা-ই
তোমার থাকার সান্ত্বনার মতো তোমার না-থাকার শান্তি।
তোমার অবসানের শান্তি কারও অনবসানে।

কিছু থাক, যা তুমি নও
তোমার শেষের শেষে অশেষ,
শুরু আর শেষ নেই ব'লে নয়,
বার বার শুরুতে আর শেষে যা উপস্থিত
শুরু আর শেষ হারিয়ে যায় বলেই যা স্থিত।
হোক তা জ্যোতির জ্যামিতি,
কোনও আকাশ, বৃত্তাভাস, নমিত রেখা,
কোনও প্রমিতি, প্রতীতি—
তবু তা আছে—উপস্থিতি আছে তার।
তাই আছে তোমার ঘরবাড়ি, ক্ষেত-খামার
স্থল, স্থান, দিকদিগন্ত,
শীত-বসন্ত, অয়নান্ত আছে তোমার—
আছে হৃৎস্পন্দনে সময়
আর নিঃসময়—মৃত্যু। ['সংখ্যা'/এক পদাবলী'র অন্তর্গত] রচনাকাল—১৩৫৪

আমরা না-থাকার বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম, কবি এসে দেখিয়ে দিলেন থাকার জায়গাটা, প্রকৃতপক্ষে কী বিরাট। আমাদের সমূহ চিন্তাসূত্র যা-যা ধারণ করতে সক্ষম তার সবখানি অন্তর্ভুক্ত হবার পরেও যে শূন্যস্থান পড়ে থাকে তা পরিমাপ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে; কবির এই বর্তাটি আমাদের উদ্বেগ ও বিষণ্ণতা ধুয়ে দিয়ে যায়। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতার সঙ্গে সময় কাটাবার পর বুঝতে পারি, তাঁর ওই নিরুদ্বিগ্ন চিত্তের বিশেষ সুরটি ক্রমশ বিস্তারলাভ করছে। অসঙ্গিতিগুলি যেন নিজেরাই নিজেদের সুবিন্যস্ত ক'রে নিচ্ছে

আবার, শান্তি ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের, পশুর, পতঙ্গের, বনস্পতির জীবনে। আমি বুঝতে পারি, যতই দুঃখ-কষ্টে ও অবমাননায় কেটে থাকুক তাঁর ব্যক্তিজীবন, হয়তো দুঃখ-কষ্টের সহায়তারই কারণে, চেতনার একটা মুক্তি ঘটে গিয়েছিল কোথাও, না হ'লে তাঁর লেখায় ওই প্রশান্তি আমরা দেখতে পেতাম না। একজন সুকবি যা-যা চাইতে পারেন তাঁর প্রায় সবই তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু কেবল সুকবি হয়ে-থাকা তাঁর ভাগ্যে লেখা ছিল না, সেইজন্য তাঁকে একে-একে হারাতে হ'ল সব—খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা, সাহিত্যের আড্ডার বন্ধু ও শিষ্যদের, নারীসঙ্গ, স্বাস্থ্য ও চেহারা—ভীষণ ক্ষতির এব সর্বগ্রাসী স্রোত তাঁকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে গেল। করবেই, না হ'লে পিছনে-পিছনে চেতনার স্রোত বইবে কী করে? তাঁর অন্তিমজীবনের একটি চিত্র সহসা কল্পনায় ভেসে ওঠে : আমি দেখতে পাই সেলিমপুরে ভোর-রাত্রি, দূরে লোকাল ট্রেনের সিটির শব্দে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ঘুম ভেঙে গেল, তিনি চোখ মেললেন, চুপচাপ শুয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, অনুভব করলেন রাত্রির জ্ঞান তাঁর মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে, বিছানা ছেড়ে উঠলেন, ঘর এথকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন, মাথার উপর তারাদের আকাশ ঘরে ফিরে এলেন, আলো জ্বালালেন, ঘুম চোখে মনে হ'ল ঘরের কোণে এক প্রেতিনী দাঁড়িয়ে আছেন, পিছনে তার বারান্দায় রাখা টবের ফুলগাছ।

দক্ষিণের ট্রেনে সিটি। ভোর-রাত্রি তোমাকে জাগায়।
চারটার ঘন্টা বাজে। প্রহরী-বাড়িও কাছে-পিঠে রাত জাগে।
মর্মরধ্বনি তো নয়। ভূকম্প লাগায়
থরথর অখ্যাত স্টেশনে।

তুব কি জাগে না কোনও স্পন্দবোধ ঘুমন্ত এ-অন্ধকার মনে
স্মরণ : এ-দক্ষিণেরই পূর্ব অনুরাগে
ছিল যে অঙ্গন-দ্বারে পল্লবিত একটি বাগান?

স্বপ্ন ভাঙে কিন্তু জেগে উঠি রূপনারায়ণের কূলে।
এখনও আকাশ দেখি। শুকতারা সুন্দরী তেমনই।
দীপাবলী জ্বালি তাই। পাতালের খনি .
নিকষ সুবর্ণরেখা আঁকে।
কী সুরম্য গলিপথ। দূর ও নিকট নেই আর।

বারান্দার থেকে ঘরে এসে দেখছি তোমাকে—
তুমি, ফের সঞ্চারিণী গান—
লতায়, পাতায়, ফুলে-ফুলে।
মাটির মেঝেতে এক ভিখারির সাজ, অলঙ্কার।

[মর্মরধ্বনি কোনও/অগ্রন্থিত]

একটি চিহ্ন যোগ ক'রে কবিতাটি তুলে রাখলাম; এই কারণে যে, যাতনা পার হয়ে-যাওয়া মধুরতার এক বিরল প্রকাশ ঘটেছিল হারিয়ে-যাওয়া বাঙলা কবিতায়। ❑